দহনদান
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

।। এক।।

ডায়েরী লেখার কোনো অভ্যেস আমার নেই। বহুদিন আগে ছোটবেলায় কাকার ধমক খেয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। মাস ছয়েক - কি টেনেটুনে বছর খানেক। তারপরে ইতি দিয়েছি। একবার এক বিখ্যাত ব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন - রোজ রোজ সময় হয় না। তাই স্মরণীয় ঘটনাগুলোকে লিখে রাখলেই যথেষ্ট। আর সেই অজুহাতেই আমার ডায়েরী লেখার ইতি।

একটা বিজ্ঞাপন সংস্থায় আমি কাজ করতাম। কাজটা এই মুহূর্তে নেই। ছোটবেলা থেকেই মডেল হবার বাসনা ছিল। সেটা আর হয়ে ওঠেনি। শেষমেশ কাজ জুটলো এই সংস্থায়। এইসব ছোটখাটো সংস্থায় যা হয় আর কি - জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সবই করতে হতো। সারাদিনের পরিশ্রমের শেষে যখন নিশিযাপনের অবকাশ মিলত তখন রাতের অন্ধকারের গর্ভে পরের দিনের ভ্রূণ জেগে উঠে নড়াচড়া শুরু করে দিয়েছে।

ছোটবেলা থেকেই একটু বেশী ওস্তাদ গোছের চালচলন আমার ছিল। ডেঁপোমি যাকে বলে আর কি! তাই হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে কলেজে ঢুকতে না ঢুকতেই প্রেম। অবশ্য আমার মতন সুঠাম সুন্দর পুরুষ মানুষের প্রেমে না পড়ে থাকাটাই যে কোনো মেয়ের পক্ষেই মুশকিল। মানে - তাহলে তার নিজের Confidence -কেই প্রশ্ন করতে হয়। যাহোক্, প্রেম এবং তার ফলশ্রুতিতে বিয়ে। কাটিতং। একেবারে দেশ ছেড়ে। বি.এ. পাশ আর হল না। অগত্যা এই প্রাইভেট সংস্থায় চাকরী - এবং - এবং -

আমার বউ ভারী সুন্দর গান গাইত। রবীন্দ্রভারতীতে মিউজিকে ডিগ্রী আছে বলেই নয়, সত্যি ওর গানের গলা অসাধারণ - তা যে কোনও গানের দিকেই হোক্। মাধুরীকে আমি পাল্টে দিয়েছি। ওকে অনুপমা বলে ডাকি। সুবিখ্যাত এক শিল্পীর ছায়াকে আমি ওর মধ্যেই দেখি। অবগাহন করি ওর সুরে, একটু একটু করে তন্দ্রাচ্ছন্নতায় ডুবতে ডুবতে এক অসীম নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো বুঁদ হয়ে যাই। এক প্রবল জলপ্রপাতের গতিময়তায় তার ঢেউয়ে নিয়ে যায় যতসব মানুষি ক্লেশ। ছোট বড় পাওয়া - না - পাওয়ার বেদনা, সংশয়ে জনে থাকা ছোটোখাটো কোনো কোনো ক্ষতচিহ্ন, দুঃখে মজে যাওয়া সব স্মৃতি, দৈহিক যন্ত্রণায় মুচড়ে ওঠা শাপগ্রস্ত জীবনের তিক্ত আস্বাদ।

এপর্যন্ত ঠিকই ছিল। বছরখানেক আগে আমার একবার প্রবল জ্বর হয়। একটা শ্যুটিংয়ের কাছে গিয়েছিলাম ন্যাগাল্যান্ড। ওখানকার আশ্চর্য সবুজ আর কুয়াশার আকাশকে বন্দী করতে। সাথে সাথে উপজাতিদের ভয়াল আতঙ্ক। অন্য এজেন্সির দেওয়া এই কাজটা বেশ চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছিল আমার। এই ট্র্যাডিশনাল অফিস জীবনের বাইরে কোনোরকম ভাবনা, ভালোবাসা ও ভয়াবহতায় মেশামিশি এক বিচিত্র উন্মাদ সঙ্গীত। অবশেষে ডাক্তারি সার্টিফিকেটের ওপর ভরসা করে এবং সেই সঙ্গেই অফিসকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দিন পনেরোর লম্বা ডুবে এবং ফিরে এসেই অসুস্থতা।

প্রথমে যাকে সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাবা হয়েছিল তা ধীরে ধীরে মারাত্মক আকার ধারণ করল। সঙ্গে গায়ে হাতে অসহ্য যন্ত্রণা। আস্তে আস্তে শরীরে অসাড়তা, পায়ের তলায় অনুভূতিহীনতা একটা একটু করে গ্রাস করতে করতে ঊর্ধ্বমুখী। পঙ্গুত্বের ঘন্টাধ্বনি যেন প্রচন্ড শব্দে পাহাড়ের কন্দরে - কন্দরে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে বেরোয়। প্রবল বিদ্রোহে আরও দিশেহারা করে দেয় শরীর।

মাস ছয়েক সাউথের একটি নামী হাসপাতালে জীবনযুদ্ধের শেষে জয়ী হয়ে ফিরলাম। অনেক আশা- আশঙ্কা নিয়ে। প্রথমিক বিপদটুকু কেটে গেল। কিন্তু অসুখটা সম্পূর্ণ সারল না। কেমন দেখব এই পৃথিবীটাকে, কতদিন কিভাবে, এইসব ভাবনা গ্রাস করতে লাগল।

সুদামাই কথাটা শোনালেন। সুদামা রামচন্দ্রন। কোম্পানীর অন্যতম ডিরেকট্র। একটু বেশীই ভালোবাসতেন আমাকে। আমার নিখুঁত প্রচেষ্টায় গড়া এই দেহখানি - অনেক যত্ন নিয়ে তিলে তিলে সঞ্চিত ব্যক্তিত্বের যতকিছু মোহাভাস, সতেজতা, আন্তরিকতা ও মন কেমন করা ভালোবাসা সবকিছু একনিমেষে, এক ঝট্কায়, পাখীর ঘাড় ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ার শব্দে অট্টহাস করে উঠল। মাঝবয়সিনী সুদামা তাঁর অতি বৃহৎ টেবিলের ওধারে প্রায় উবু হয়ে বসেছিলেন। বুকটা টেবিলের উপরিতলে আশ্রয় - প্রশ্রয় দুই - ই পাচ্ছিল। ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে বিশুদ্ধ বাক্য বিন্যাসে বললেন - রাগ করোনা প্লিজ, We are simply helpless! তবে সেনকে বলে দিচ্ছি তোমাকে Exgratia কিছু দিয়ে দেবে। and I believee, He will do it, atleast for you! Practically we have lost about a crore by this time due to your absence! বলো তো আমাদের জানিয়ে গেলে কি অসুবিধেটা হত! It might be a case that you won't get permission, আর কারণটাতো তোমার জানা। মেহেতা গ্রুপ আমাদের আগে অ্যাডটা-র ব্যাপারে এগিয়ে যাবে আর তুমি তার প্রিন্সিপাল কজ্ হবে We could not believe it! তুমি না গেলে তোমার Health & Service, both protected হতো, তাই না! এত ছোটো কোম্পানী, আর কত আর Turnouver! তুমি হয়, তবে it becomes difficult to overcome the setback. তবে I really feel sorry. আসছে মাসে তোমাদের invite করব - ওঃ by the way তোমার wife কে যে লাগবে রবীন্দ্রসদনে আমাদের সিলভার জুবিলি সেলিব্রেশনে - কিছু Giftএর বন্দোবস্ত রাখা হচ্ছে for special guests and for our achievers also. তোমার নামটাও আমি কিন্তু জোর করে ঢুকিয়েছি - although Board did not agree.সুদামা বলে চললেন - ভাবোতো আমার কতটা pain হচ্ছে, after all আমি তো তোমাকে select করেছিলাম।

মনে পড়ে গেল, দু বছর আগে গ্লোব সিনেমায় নিভৃতে উনি হাতটা টেনে নিয়েছিলেন। অন্ধকারের মধ্যে বুকের ধুকপুকুনিটা টের পাচ্ছিলাম বেশ। মাধুরীর ব্যথিত মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বেতের ফলের মতো নীরব - নীল ব্যথারা সেসব।

কিছু পেতে গেলে তো কিছু দিতেই হয়। ভেবেছিলাম তখন। এখনও ভাবলাম।

।। দুই ।।

অনিন্দ্যকে বিয়ে না করে আমার উপায় ছিল না। ওর সঙ্গে কলেজে পড়ার অনেক আগেই একবার মোলাকাত হয়েছিল। ওর অবশ্য সেসব মনে খাকারই কথা।

বেশ ভালো তবলা বাজাতো অনিন্দ্য। আমাদের এ তল্লাটে ওর মতো বাজিয়ে কেউ ছিল না। ফলে ফাংশনে প্রায়ই ডাক পড়ত ওর। একটু খামখেয়ালী, হয়তো বা একটু অহংকারীও ছিল। যার তার সঙ্গে বাজাতে চাইতো না। তবু পাড়ার দাদারা ওকেই সাধাসাধি করতো ফাংশনও জমে উঠত ভালো।

ছোটোবেলা থেকেই আমি আদরে মানুষ। তিন দাদার পর আমি এক বোন। ফলে সোহাগ আহ্লাদ সব কিছুই বেশী। আমাদের বংশে আবার ছেলেদের সংখ্যা বেশী। কাকা - জ্যাঠাদের কোনো মেয়ে নেই। তাহলেই বোঝো ব্যাপারটা। গান, নাচ, আঁকা, আবৃত্তি সবকিছুতেই বাবা উৎসাহী ছিলেন। আর আমিও যেন বাবার ইচ্ছেঘুড়িটাকে অনেক দূর উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারতাম। বিশেষতঃ গান ছিল প্রাণ, আমার একান্ত ঈশ্বর সাধনা। অনেকরকম অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হতো আমার গানের বেলায়। গানের মাস্টারমশাই যখন একেকটি রাগ গাইতে বলতেন, তখন আমি প্রত্যক্ষ করতাম এই দেশ, কাল, মানুষের পরিধির বাইরেও কিছু হয়ে চলেছে নিরন্তর, এক সংঘটন, মহাবিশ্বে তার রেশ ছড়িয়ে যাচ্ছে আলোর পিঠে সওয়ার হয়ে, আর সুরে কটি পর্দা, সাতটি সরগম যেন সাতটি রঙের হয়ে উঠছে। ছবিগুলো পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে অবিরত আর চেতনার এক স্বতঃপ্রবাহের সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, তার রূপও বদলে যাচ্ছে ক্ষণেক্ষণে। প্রাকৃতিক জগৎ সেই নান্দনিকতার উৎসমুখ থেকে গ্রহণ করছে আনন্দধারা আর তাকে আঁজলায় ভরে ভরে তুলে নিচ্ছে আকণ্ঠ পানের তাগিদে। তৃপ্ত বসুধা, তৃপ্ত দ্যুলোক, ধরিত্রীর সবকিছু।

যাক্ যা বলছিলাম। সারা জেলা মার্গসঙ্গীত প্রতিযোগিতা। যথারীতি বাবার উৎসাহের শেষ নেই। ওস্তাদজিকে বলা আছে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছনোর জন্যে। সবাই অধীর আগ্রহে আছে আমার গান শুনবে বলে।

কিন্তু যা কপালে ছিল! মোক্ষম সময়ে ওস্তাদজি খবর পাঠালেন তাঁর এক ভাইয়ের ইন্তেকাল হয়েছে। খবর শুনলেই যেতে হবে এই রীতি। হাতে সময় তখন মাত্র আধঘন্টা এবং আমার অবস্থা তখন তথৈবচ।

এমন সময়ে অনিন্দ্যই বাঁচাল। কে খবর দিয়েছিল মনে পড়ছে না ঠিক। তবে দেখলাম স্টেজে সে উঠল। ব্যাজার মুখ করে বসেছিল। কি রাগ গাইব জিজ্ঞেসও করল না। ক্লিন্তু আমাকে তো বলতেই হবে। কোন্ তালে বাজাবে বলতে যেতেই খিঁচিয়ে উঠল। জানি জানি - গাওতো - একটা গা ছাড়া ভাব। কি আর করা যায়! গান তো হল খুব ভাল। সঙ্গে তবলাও। প্রচুর প্রশংসা আর হাততালিও। এরমধ্যেই সে কখন চলে গেছে টের পাইনি। ধন্যবাদ দেওয়ারও সুযোগ বা সময় দিল না।

এর পরের ঘটনা কলেজে। হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করার পর একই কলেজে ভর্তি হলাম। এ তল্লাটে একটাই কলেজ। প্রথম দিন থেকেই ছাত্রসংসদ উত্তাল। কিনা, অনিন্দ্যর পাগলামো। সে নতুন কিছু নিয়ম চালু করতে চায়। পুরনো নেতাদের মৌরসীপাট্টা চলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। হট্টগোল, মারামারি। ওর হাত-পা কেটে একসা। মুখে কষের কাছে রক্তের দাগ। ধরাধরি করে কেউ কেউ পৌঁছে দিল বাড়ীতে।

একদিন ক্যান্টিন থেকে ফিরছি - পথ আগলে এসে দাঁড়ালো। আমার হাতে একটা ফিস্‌ফ্রাই ধরা ছিল - টিফিনে খাব। বাড়ী থেকে পাঁউরুটি, টোস্ট এনেছি। ওটা যথেষ্ট নয়, খিদে পেয়ে যাবে তাই। ক্যান্টিনে খেতে ভালো লাগে না। ওঁচা ছেলেগুলো লুকিয়ে - চুরিয়ে দেখে। মুখ দিয়ে অসভ্যের মত আওয়াজ করে - চকাস্ চকাস্।

কোনোরকম ভনিতা না করেই বলল - কিরে দিবি নাকি একটুখানি! এমনভাবে চোখ আর কাঁধ নাচালো, মনে হল ঠাস করে দিই এক চড়। মাথাটা ঝুঁকিয়ে কাঁধ ঘুরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে এলাম। শুনতে পেলাম অস্ফুটে বলছে - বাব্বা!

- ''কি রে''। ও বলল।

- ''ফ্রেঞ্চ টোস্ট।''

-''ছাড়। ইন্ডিয়ানেই পোষাচ্ছে না। আবার ফ্রেঞ্চ। তা যদি ফ্রেঞ্চ লেডি-র সন্ধান পাস্ তো বলিস, ট্রাই করব।''

সম্পূর্ণ আমার উদ্দেশ্যে। আমি না একটু বেশীই ফরসা আর পারফিউমটা একটা বেশি মাখি। তাই বলে।

প্রফেসার হীরেন ভট্টাচার্য্য সেদিন সে যা নাস্তানাবুদ করলেন আমাদের! এমন সব ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন যে ধরতেই পারছিলাম না আমরা। এই যে ছোকরা, এসব মেড ইজি হবে না। বুঝেছ। কটা টেক্‌স্ট্ বই পড়েছ! ওরিজিনাল না পড়লে বুড়ো ষাঁড় হবে। আর মামনিদের কোনোও প্রবলেম নেই। বিশেষ আগ্রহে কিছুদিন বাদেই সুক্তনি রাঁধবেন, মোচার ঘন্ট, পুঁই শাকের ছ্যাঁচড়া এইসব। কিস্যু হবে না। যে কটা দিন আছো পড়ে নাও। আমি আগামীদিন জিজ্ঞেস করবো। ছেলেরা না পারলে কান ধরে বেঞ্চির ওপর দাঁড়াবে। আর মেয়েরা না পারলে সোজা বাইরে বার করে দেবো। এমনই দোর্দন্ডপ্রতাপ ভাইস্‌প্রিসিন্সপ্যালের। অনেক ধমকটমক দিয়ে একটা বইয়ের নাম বলে দিলেন - এক্ষুণি লাইব্রেরী থেকে তুলে নেবে। একমাস সময় দিলাম শেষ করার জন্য। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি বই ইস্যু হয়ে গেছে। দুটো ছিল আমাদের জন্য - একটা পেয়েছে রেশমা - লোকাল এম. এল. এ.-র মেয়ে। অন্যটা তিনি। হন্তদন্ত হয়ে কাউন্টারে পৌঁছতেই যা ফিচেল হাসিটা দিল, তাতেই বুঝলাম কি শয়তান! পারমিতার তো কেঁদে ফেলার অবস্থা। ওকে বলল - ''বোনটি যেদিন বই ফেরৎ দেবে, তোমাকেই দেবো। এমনতো কত দিয়েছি। তোমাদের অনেককেই।'' - সেই গ্রাইপ ওয়াটারের অ্যাডটা হয় না- সেই ঢং -এ। গা জ্বলে গেল। রেগে গট্‌মট্ করে বেরিয়ে এলাম। কি নির্লজ্জ, কি নির্লজ্জা। দুদিন পরেই একহাট ছেলেমেয়ের মাঝখানে পারমিতাকে ডেকে নিয়ে বলল - 'বইটা ফেরত দিচ্ছি।। তুই তুলে নে।'' আমি যে অমনভাবে সেদিন দৌড়ে গিয়েছিলাম একবার ভাবলও না। অথচ ওতো দেখেছিল আমাকে। আমার আন্তরিকতাকে তো মর্যাদা দিতে পারতো। চোখের জল এসে গেল আমার।

বিকেলে একা একা বাড়ী ফিরছি। মনটা ভালো নেই। একে তো পড়াশোনা করার উপযোগী পরিবেশ নেই, তারপরে বইয়েরও সমস্যা। মনে হচ্ছে পড়াশোনা ছেড়ে দিই। বাড়ীর পথে একটা ফাঁকা মাঠ পড়ে। এদিকে - ওদিকে কিছু টিলা, উঁচু - নীচু, খেজুরগাছগুলো একা একাই দাঁড়িয়ে থাকে। শীতের সময় ছাড়া কোনো মর্যাদা ওদেরও নেই।

হঠাৎ করে খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে সে এল। হাঁফাতে হাঁফাতে। বলল - ''কতদূর থেকে ডাকছি, শুনছিল না যে।''

আরে কখন আমাকে ডাকল! কি মিথ্যুক। নিজে নিজেই বলল, ''আসলে জোরে জোরে ডাকিনি। কত নির্জনে যে ডাকি! সমসময়। এই গাছ, লতা - পাতা যেমন আকাশের দিব্দকে চেয়ে থাকে, তেমনই তোর দিকেও আমি চাই। এনিওয়ে - আমি - আই অ্যাম সরি।''

- ''সরি আর কি! এবারে সরো।''

- ''বিশ্বাস কর্, তোকে কি ভীষণ লজ্জা পাই। কি করে যে তোকে দেব, ভাবতেই পারলাম না। যাক্‌গে পারমিতাকে বলে দেবখন। তুই নিয়ে নিস।''

-''আমার দরকার নেই। পাড়ীতে গিয়ে তো শুক্তো রাঁধব।''

- ''আমার জন্যে?''

- ''ঢং করতে হবে না। ইঃ! পড়াই ছেড়ে দেব।''

- ''আমার জন্যে যদি ছাড়িস, তবে আমিও ছাড়ব। দেখিস, শুধু পড়া নয়, সবকিছুই।''

- ''ওসব দেখে আমার কাজ নেই।''

- ''বেশ্, দেখা যাক্।''

সত্যিই ও এল না। পরদিন থেকেই। একদিন, দুদিন ..... পনের দিন। পারমিতা বই ফেরৎ দিল। আমি নিলাম। ও নাকি বলে গেছে। প্রায় মাস তিনেক হল। সব ভুলে গেছি। আস্তে আস্তে মন বসছে। কেউ তেমন আর বিরক্ত করে না। যে যার মতো আছে। এ তল্লাটে সে নেই।

একদিন সকালে খুব হট্টগোল। শুনলাম বাজারের লোকগুলো নাকি কাল রাতে একজনকে গঙ্গা থেকে টেনে তুলেছে। বেঁহুস হয়ে পড়েছিল কাদায়। অনেকটা জল খেয়েছে। ব্যাটা মরতে যাচ্ছিল। বরাত জোরে বেঁচে গেছে। পকেট থেকে একটা চিরকুট পাওয়া গেছে। কাকে যে ভালোবাসে ভেবেছিল। হয়ে ওঠেনি, তাই। এসব কেচ্ছা - কেলেঙ্কারির ব্যাপারে।

ছোড়দাই এসে ডিটেলে সব বলল। - ''বুনু, জানিসতো ব্যাটা অনিন্দ্য। আরে তোর সঙ্গে যে পড়ত! আমার তিন বছরের জুনিয়র। ওর দাদাই তো বলল। অনুপমা না কি যেন মেয়েটার নাম। লিখেছে, তোমাকে বইটা না দিয়ে অন্যায় করেছি, তাই পড়া ছেড়েছিলাম। এখন জীবনও ছাড়ব। তুমি আমার কাছে অনুপমা হয়ে থাকো চিরকাল।''

বুঝলাম ব্যাপারটা। কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারলাম না। দুদিন বাদে লুকিয়ে দেখা করলাম ওদের বাড়ীর কাছে। বললাম - ''পালাবে!''

বলল - ''খাওয়াবো কি!''

- ''যা খুশি। তবে অসভ্যতা বাদ দিয়ে''

বিষণ্ণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। - ''সত্যি-ই তুমি অনুপমা''।

পালালাম, একেবারে বাড়ী - ঘর ছেড়ে। ভালোবেসে আত্মহত্যা করলাম কিনা জানিনা।

।। তিন।।

দরবারী কানাড়া গাইছিল অনুপমা। সময়টা সকাল গড়িয়ে গিয়ে বেলা দুপুরের দোরগোড়ায়। কেউ নেই কাছাকাছি। শ্রাবণের মেঘ আরও ঘন হয়ে এসেছে। বাতাসে একটা উদাস ভাব - যেন সে বইতে চাইছে না, বলতে চাইছে না কোনো কিছু। মন নিঙড়িয়ে দুঃখরা টপ্‌টপ্ করে বেন্দিরয়ে আসতে চাইছে। কোথায় কি অবস্থায় তারা এতদিন ছিল কে জানে?

মন্দ্রসপ্তকের নিষাদ থেকে আরোহে মধ্যসপ্তকে ষড়জ ঋষভ হয়ে গান্ধারে পৌঁছে যায় অনুপমা। গান্ধারে আন্দোলন রে কে ছুঁয়ে আবর্তিত হয়ে থাকে। বারবার ঋষভকে স্পর্শ করে যায় গান্ধার। অবশেষে অবরোহে কোমল নিষাদ থেকে দীর্ঘ মীড় দিয়ে পঞ্চমে যখন সে পৌঁছয় তখন বুকের পাঁজর থেকে দীর্ঘশ্বাস এক অনাগত কালের স্মৃতিরেখা

ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। কত কথা, বেদনার মালারা ঝরে ঝরে পড়ে। মনে পড়ে, অনিন্দ্য একটা বন্দিশ বেঁধেছিল - অনামী রাতে যদি মনে পড়ে, কত কথা বেদনার মালা ঝরে....। সেই সুর ক্রমাগত হৃদয় মোচড়াতে থাকে। চলতেই থাকে তার রেশ। অবরোহে ধৈবৎ শেষ করতে গিয়ে দেখে, চোখের পাতাটা অসম্ভব ভারী হয়ে উঠেছে। আর একটা কষ্টকর যন্ত্রণা গলায় কাছটায় আটকে যাচ্ছে। তানপুরায় ষড়জ - পঞ্চম অভ্যস্ত হাতে বাজতে থাকলেও তা কোনো সঙ্গীতের স্বাদ দেয় না। হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি এসে যায় হঠাৎ হঠাৎ। সব ছবিরা অস্পষ্ট, জানলার ঘোটালে কাঁচ দিয়ে ঝরে যায়।

অনিন্দ্য সকালবেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে। তুমুল অশান্তি হয়েছে আজ। সে কিছু খায়নি। ভাতের থালা তেমনি পড়ে আছে টেবিলের ওপর। আলুসেদ্ধ, ডিমসেদ্ধ সব। ডালভাতে। অনিন্দ্যর খুব প্রিয়। সে তো তেমন কিছু বলেনি। শুধু তার জমানো টাকাটা তুলে দিতে খোঁজপত্তর করে চেক পাঠিয়েছেন, রাজু কাকার মারফৎ। বাবার মামাতো ভাই। ওনার কোনো ছুৎমার্গ নেই। অনেকবার বলে গেছে ওনার বাসায় যেতে। যাব বলেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অকৃতদার ভদ্রলোক একটি প্রাইমারি স্কুলে পড়ান। এছাড়া রাজনীতি নিয়ে দিন কাটাটে তার। তবে অনিন্দ্যকে তিনি সবরকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদি দরকার হয়। তার সাধ্যমতো। অনিন্দ্য শুনে হেসেছে। সেই গা জ্বালানো বাঁকা হাসি। যেন ভাবখানা এই - তুমি নিজের চরকায় তেল দায় গে বাপু, আমার ভালো করে কাজ নেই তোমার।

অথচ অনিন্দ্য তো এমন সুযোগটা নিতে পারত। বিশেষতঃ চাকরীটা যাবার পরে। অ্যাড এজেন্সীতে কাজ করার কুফলটা তো পেয়ে গেছে সে। অসম্ভব খরচের ধাত। পাউডার, পারফিউম, আফটারশেভ। জামা - প্যান্ট দুদিন ছাড়া পাল্টানো। কাচা , ইস্ত্রি করা। নতুন টাই, জুতো। সাফারী স্যুট মোট ছটা। এ্যতো থাকে নাকি কারুর!

সে কিছু বলেনি এতোদিন। বাবার টাকা ভাড়িয়ে দিয়েছে যখনই প্রয়োজন এসেছে। মনে মনে স্বপ্ন দেখেছে অনিন্দ্য একজন নামী মডেল হবে, আর সে গায়িকা। রবীন্দ্রসদনে শো হবে তার। অনিন্দ্য প্রোগ্রাম কম্পোজ করবে। প্রচুর প্রশংসা, ডিনারে আমন্ত্রণ, খবরের কাগজে মাতামাতি। তারপর অনিন্দ্যকে কোনো একদিন টেলিফিল্মে দেখা যাবে। আর শীর্ষসঙ্গীত তার। কাস্টে রোজ দেখবে তার নাম। তার গানগুলোই সিরিয়ালটাকে চিনিয়ে দেবে। যেমন রামানন্দের রামায়ণ কিংবা চোপড়াদের মহাভারত।

যেদিন চাকরীটা গেল সেদিন বেশ রাতে এসেছিল অনিন্দ্য। আলো না জ্বেলে গুম মেরে বসেছিল। জিজ্ঞেস করতে যেতেই খিঁচিয়ে উঠল। মাঝরাতে ঘুমোতে ঘুমোতে সে শুনতে পেল, কে যেন ফোঁপাচ্ছে। যে বলছে, বিনাকারণে ... আমি নির্দোষ ....।

পরেরদিন সকালবেলা বেরলো না সে। বেশ বেলায় জানিয়ে দিল কালকের ইতিকথা। কি করবে বুঝতে পারছিল না। মাথার চুল খামচে খামচে ধরছিল।

দু-তিনদিন এভাবেই গেল। এরপরে একদিন এসে জানালো, প্রমোটারি করবে। পার্টনারশিপে। বাজারের ধারে কিছু জায়গা নিয়ে ফ্ল্যাটের কথা চলছে। তার এমন কাজ দেখাশোনা করার। বড় বড় পার্টি কন্ট্যাক্ট করা। যদি মাল্টিপে-ক্স ভালো কোনো কোম্পানীকে আনতে পারে, তাহলে কেল্লা ফতে। কিছু মাল ঢালতে হবে অবশ্যি। দুই - আড়াই লাখ। তো সেটা অনুপমা ম্যানেজ করতেই পারে বাবাকে বলে। যেন যেমন হবে, ফেরৎ দিয়ে দেবে। এমনিতে তো বাইরের কেউ সিকিউরিটি চাড়া লোন দেবে না। এটার ব্যাপার আলাদা। মেয়ে - জামাই বলে কথা।

অনিন্দ্য তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সারাদিন বক্‌বক্ করার পর সন্ধ্যাবেলায়। স্টেশনের কাছাকাছি একটা ঠেকে। মিষ্টির দোকানে পাশে গলিতে টুল নিয়ে বাস দু-তিনটে ছোকরা খৈনি ডলছে। ওটা এখন লেটেস্ট নেশা। পানপরাগের পরেই। কথায় কথায় বিশেষণ ব্যবহার করছে। প্রায় অনুচ্চারিত সমার্থক শব্দ গোছের একটা উপমা মনে পড়ল তার। যেন নিজেদের উচ্চারণে নিজেরাই বিভূষিত। গা গুলিয়ে উঠছিল তার।

অনিন্দ্য এগিয়ে গেল। একটু দূর থেকে দেখাল সঙ্গে মিসেস এসেছে।

পাকা গোছের এক ছোকরা মুখ বেঁকিয়ে যেন বলল - আ, তা কি করতে হবে বে -! অন্য আরেকটা মুখে টুসকি দিয়ে হাল তুলল। বলল - বেড়ে ঝেড়েছ হে মাইরি।

অনিন্দ্য কিছু বলল না, মনে হল বলতে চাইল উনিই টাকা দেবেন। তাই দেখা করাতে নিয়ে এলাম।

তিন নম্বর ছোকরাটা উঠে এসে ধাঁ করে বলল - ম্যাডাম, কি পিবেন? ডাকো তোমাদের দাদাকে।

ও দাদা, বৌমনি ডাকছে - তিন নম্বরীটা বলল। দু নম্বরীটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কেতরে। বিশেষ ভঙ্গীতে, আরাম উপভোগের আশ্লেষে। পকেট থেকে দেশলাই কাঠি বার করে কান খোঁচাচ্ছিল।

বড়টাকে বলতে শুনলাম - ওসব বউ ফউ ক্যাদ্দানি ছাড়ো। মাল আনলে পাটি হবে - নইলে হাওয়া।

দ্রুত পা চালিয়ে এলাম। একটা রিক্সা ডাকলাম। অনিন্দ্য আওয়াজ দিলো - এই ভাই, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি তাড়া দিলাম। আমার কাজ আছে। শিগ্‌গির চলো। রিক্সাওয়ালাটা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চাইল। ধমক দিলাম, কি হলো! পয়সাতো দেবো আমি। তোমার দাঁড়ানোর কি হল? চলো শিগ্‌গির।
কোনোরকমে বাড়ীতে ঢুকে সটান বিছানায়। খিল তুলে দিলাম ছোটঘরে। বাইরের বারান্দাটা খোলা পড়ে আছে। থাকুক। চোরে নেবার মত আর কিছু নেই।

এত কথা সে ভেবে চলেছিল খেয়াল ছিল না। অথবা গত রাতের ঘটনাগুলো যেন পুনরাবৃত্ত হয়ে হয়ে তার উপস্থিতি টের পাইয়ে দিচ্ছিল। গানবেলা শেষ হওয়ার পন্দের স্মৃতিগুলো। কত সুখের জীবনের প্রত্যাশে থাকে মানুষ। ছোট ছোগ গান বাঁধতে চায়। ''কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি'' - এমনতরো সেসব গান। দগ্‌দগে ঘা হয়ে জেগে থাকে শুধু বাস্তব কঠিন জীবন। ভালো লাগে না কিছু। শুধু শেষ শেষ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। বড় সাধ জাগে মরে যাই। এ দুঃখ বিলাস নয়। অনেকরকম ভাবনায় ভাবিত হয়ে হতে কষ্টের বোধগুলো এমনসব বক্রগতির জন্ম দেয়। ধ্বংসাত্মক সবকিছু।

তানপুরার সা-পা ছেড়ে দিয়ে আঙুল গুটিয়ে নিয়েছিল। তার বহুদিনের সঙ্গী, কোলের গভীর উষ্ণতায় তার গড়নে আদর আদর মাখামাখি। তাকে ছুঁয়ে দিলে সে বেজে ওঠে। হঠাৎ হঠাৎ ভালো লাগাগুলো তাকে বলা যায়। বিষণ্ণতাও।

বৃষ্টির ছিপ্‌ছিপ্ জলধারার মধ্যেই স্নান করছিল তুলসী। জানলা দিয়ে সামনের বাড়ীর উঠোনটা দেখা যায়। একটু আবডাল। এবাড়ীর পেছনের দিক্ ছাড়া অন্য কোনোদিক খোলা নেই, টিপকলের জায়গা।

তুলসী সুন্দর করে গা ঘষছিল। একটা একটা হাত, পা সযত্নে সাবান দিয়ে ধুচ্ছিল। একটা একটা স্বরের সাধনার মতো। প্রতিটি অংশকে বুঝে নিয়ে ভালোবেসে চলা। হৃদয় দিয়ে। সে ভাবল। ভারী ভালোবাসায় ভরে গেল মন। এমনিই - হঠাৎ।

সে জানলা দিয়ে মুখ বার রে ডাকল - তুলসী, এই তুলসী।

দুবার এদিক ওদিক চেয়ে তুলসী ঠাওর করতে পারল। তুলসী মাঝেমধ্যে তার ফাই - ফরমাশ খাটে। দোকান থেকে ডিমটা, চালটা এনে দেয়। অনিন্দ্য যখন থাকেনা বা তাড়াতাড়িতে থাকে, তখন।

- কিছু বলছ দিদিমনি!

- একটু শোন্ না এদিকে। আমার বাড়ী আসবি?

- এই মানে, একটু ঠাকুর পুজো করে দিতে হবে। চান করেই চলে আয়।

- দাদা নেই ? তোমার কোনো অসুবিধে আছে বুঝি?

- অত কথায় কাজ কি তোর। একবারটি আয় না! ভালো করে নেয়েধুয়ে আসবি।

লোকের একটু উপ্‌কার বইতো নয়! তুলসী ভাবল। গায়ে জল ঢালল।

অনুপমা দেখছিল সবকিছু। জলের ধারা কেমন করে দেহ বেয়ে নামে। প্রতিটি স্বরের মতো। পূর্ণাঙ্গ শরীরে লেপ্টে থেকে ঝরতেই থাকে। দীর্ঘ মীড় দিয়ে আবর্তনের মতো ফিরে আসা। এতো ভালোবাসি, তাই ছেড়ে গিয়েও ছাড়া যায় না। বার বার ঘুরে ফিরে এসেও আসি তবে, বলতে হয়। ফিরতে যেতে ইচ্ছে হয় নাকো।

তুলসী স্নান সারল। জলে ভিজে উঠল তার অর্ধপুষ্ট দেহ। হয়তো বা অভাবেই সুডৌল হতে পারেনি। নারীসুলভ কোমলতায় পূর্ণ হতে গিয়ে থমকে গেছে হঠাৎ।

সে চান করে চুলটা ঝেড়ে নিল ঝপত্রাৎ ঝপাৎ। হাঁটুর ওপর কাপড়টাকে তুলে নিয়ে নিংড়ে নিল। দিদির বাড়ীতে জলে জলোম্ময় হবে। সে ঢুলে পড়ত। আঁচল দিয়ে উড়িয়ে দিত মা। কথা বললেই অদ্ভুদ ভাবে নড়ে উঠত মায়ের পেট। সেই ছন্দ নিয়েই সে ঘুমের গভীরে তলিয়ে যেতে একটু একটু।

তুলসী ঠাকুরঘরে ধূপ দ্রিচ্ছে। প্রদীপ জ্বালিয়েছে। তার ঘরে ফুল নেই। নকুলদানা দিয়েছে থালায়। দুটো - চারটে। এবত্রার হাত জড়ো করে মাথাথা ঠেকাল। তার ভিজে গা থেকে টুপটুপ করে পড়ছে জল। গায়ে লেপ্টে আছে শড়ী, জামা। ভেতরের অন্তর্বাস। দেখতে দেখতে ভাবল অনুপমা, তাকেও কি এমনই লাগে! এমনই ভালো! কখনও নিজেকে দেখার কথা মনে হয়নি তার। এমন ভাবেই।

গতরাতের অনিন্দ্য এসেছিল তার কাছে। সে কাঠ হয়ে পড়েছিল। বিরক্তিতে, ঘেন্নায়। মনে হয়েছিল পুরুষেরা শুধু শরীরই চায়। শুধুই শরীর। তাদ্দর এভাবে কি ভুল? 'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, একি মোর অপরাধ' - এ গানে কি শরীর ছাড়া কোনো ভাষা নেই? এ গান কি শরীরের আকাঙ্খায় রচিত অথবা অন্য কোনো এক গভীর ব্যঞ্জনা আছে, যা শরীরের মাত্রিক জ্যামিতিকে ছড়িয়ে অন্যতর কোনো বোধের সন্ধান দেয়। অমৃতকুম্ভ কি আছে এই শরীরে? অথবা তা মনে নির্যাসে একটু একটু করে গঠিত হয়, যখন একটু একটু করে ভালোবাসায় ভরতে থাকে শরীর! যখন সে ভাবে, ভালোবাসা - আর ভালোবাসো, এই ভালোবাসায় মনে যাই! জানেনা সে, জানতে চায়ওনা সে। কোনো তর্ক মনে আনতে ইচ্ছে করছে না তার এখন। বুক ধড়পড় করছে কেমন যেন।

ধা তেটে ঘেড়ে নাক, থুন্না কেটে তাক, ধা তেটে ঘেড়ে নাক - দ্রুত অতিদ্রুত লয়ে বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে। কিচ্ছু - কিচ্ছু ভালো লাগছে না তার। শুধু নিষ্পিষ্ট হতে ইচ্ছে করছে। তারদ্দর দেহবল্লবীর ভোগবিলাস - ভালোবাসা, তার আলাপ - বিস্তার - তান - সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে।

তুলসী সিঁড়ি দিয়ে নেয়ে আসছিল। দু জংঘার মাঝে রুদ্ধ যৌবনের ভিজে গন্ধ। অনুপমা ভাবল, তাকেও কি কখনও কেউ এমনভাবেই আবিষ্কার করেছে! সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তাকে দেখে তুলসী হাঁ করে চেপে রইল খানিক। তারপরে ধীরপায়ে বেরিয়ে গেল। অনুপমা চাইছিল তুলসীর হাঁটা একটু শ্লথ হোক্। একদম মনেপ্রাণেই।

।। চার।।

নন্দর দোকানে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল অনিন্দ্য। সকাল গাড়িয়ে গেছে বহুক্ষণ। কোনো কাজ নেই এমনিতে। এ কটা দিনে নয় একদমই। চাকরী যাওয়ার শুধু ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোর। কোনোরকম সাফল্য ছাড়াই।

রবিবাসরীয়তে যে গল্পগুলো বেরোয়, এককথায় অসাধারণ। বলতে গেলে সারা সপ্তাহের রসদ থাকে সেখানেই। আগে নিয়ম করে পড়ত নিবিষ্ট মনে। ইদানীং সময় পাচ্ছিল না একদমই। এখন আবার নিশ্চিন্ত। খবরের কাগজ পড়ার ব্যাপারে অন্তত। নন্দর দোকানে বাসী। কাগজ। তাই উল্টে দেখছিল।

উত্তমার লেখা একটা গল্প পড়ছিল অনিন্দ্য। দুই বাগানের দুই মালির গল্প। দামী ফুলের বাগানে হঠাৎই এক আগাছা মাথা তুলে ওঠে। বাঁচতে চায়। মালী তাকে বাঁচতে দেয় না। উপড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় পথের ওপর। অপাঙতেয় সে।

পাশের বাগানের মালী যত্ন করে আগাছাটা তোলে। এমন অদ্ভুত ফুল সে আগে কখনও দেখেনি। তার সব্জি বাগানের এক কোণে সে পুঁতে দেয়। দেখতে চায়, বড় হলে কেমন হবে সে গাছ।

আগাছা বেড়ে ওঠে আপন খেয়ালে। ঠিক ভরপেট না খেতে পাওয়া শিশুদের মতন। কেমন অনিবার্যভাবে নিটোল, নধর হয়ে ওঠে সে। সকলের অলক্ষ্যে তার বেড়ে ওঠা এক চমকে পালাবদল ঘটায়। হঠাৎ করে এক মিষ্টি ফলের জন্ম দিয়ে ফেলে সে। এমন ফল কেউ আগে দেখেনি।

দামী ফুলের বাগানের মালী এসে গাছটি চায়। অনেক পয়সা দেবে সে। সব্জী বাগানের মালী কিছুই বলে না। একদিন হঠাৎ করেই আগাছার শেকড়ে টান পড়ে আবার। অন্য বাগানের মালী শোধ নেয়।

অনিন্দ্য গল্পটা পড়ে চুপ করে বসে থাকে। চারদিক কেমন যেন নিস্তব্ধ মনে হয়। নন্দর দোকানের পুরনো টেবিল পাখার গোঙানি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না। উনুনে হাওয়া দওয়ার জন্য সে পাখাটা রাখে।

নন্দ এসে বলে - বাবু চা দিই এক কাপ।

- নারে, আজ আর চা খাব না।
- আপনের তো দু কাপ না হলি চলে না।
- আজ ভালো লাগছে না রে। অনিন্দ্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
- বাজারের ফ্ল্যাট বেচাকিনি হবে না। আপনে যে বলছেলেন।
- নারে নন্দ। তোর দোকানেও আর আসব না।
- রাগ করলেন! আমি কি দোষ করলাম?
- সময় হবে না রে।
- বড় কাজ পেয়েচো বুঝি! ভাল, ভাল। ওসব বাজে কম্পে যেয়ে লাভ নেই। চ্যাঙড়া ছেলেগুলোন সব। সব কাজে লেগে আছে সবসময়।
- নারে ভাবছি দেশত্যাগী হবে। কাজ খুঁজতে বেরবো আবার।
- সেকি! বৌদিমনি কি করবে?
- যা করার তাই করবে। ওসব ভেবে আমার কাজ নেই।

টক্ করে উঠে পড়ল অনিন্দ্য। বাড়ী যাবে কিনা বুঝতে পারছিল না। কিছুই ভালো লাগছিল না। ফুল বাগানের আগাছার মতোই সে অপাঙতেয় এখন। তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সবাই। তার অফিস, তার বৌ। এই সময়ও !গতকাল বেশ রাত করেই ফিরেছিল অনিন্দ্য। অনুপমার যে কি হলো হঠাৎ। প্রমোটার ছেলেগুলো ওরকমই হয়। জীবনে তেমন কিছু ভালো দেখেনি ওরা। আগেকার দিনে তবু বাপ - দাদার ঘাড়ে বসে খেত। এখন সব হিজ্ হিজ্ হুজ্ - হুজ্। টিকরমবাজ লোকগুলোর সঙ্গে রাগড়াতে রগড়াতে ওরা ওরকমই হয়ে গেছে। সব জায়গায় শুধু লাইনবাজি। খালি মামা, কাকা, দাদা খুঁজে বেড়াও। সেতো এখানে আর মামা, দাদা পয়দা করতে পারবে না। তাই নিজের ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে চেষ্টা করেছিল একটা। তবে ক্যাশ না ছাড়লে কেউ যে বশ হয় না - সেটা অন্ততপক্ষে অনুপমার বোঝা উচিত ছিল। অনিন্দ্য চেয়েছিল - বৌকে দেখে একটু বারগেনটা কম হোক্। এই প্রথমবার প্রমোটারদের সঙ্গে ব্যবসায় নামা। ওর কাছে তেমন কিছু ক্যাশও নেই। এ লাইনে আসার ইচ্ছেও ছিল না তার। কিন্তু চাকরীতো আর দোর গোড়ায় হেঁটে হেঁটে আসবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতাতেও তো ঢুঁ-ঢুঁ। যেখানেই যাও না কেন, ওখানটা ধরে টান দেবে। মিনিমাম গ্রাজুয়েশনটুকু তো চাই। অনু তো একটু হেসে কথা বলতে পারত। অন্তত তার কথা ভেভবে। তা নয় যেন ওর গায়ে ফোস্কা পড়ল। ওসব কি আর গায়ে মাখতে আছে? শালা দু-হাজার সাল পেরিয়ে গেল, কিন্তু অনুর ঢঙপনা গেলনা। যে ন্যাকড়ার ঘোমটা দেওয়া পুতুল। ওদের অ্যাড এজেন্সির তুখোড় মেয়েগুলোকে যদি দেখত। রিনি, পমি, বনি, শালা ডব্কা মালগুলো যে কি –

কাল একটু বেশীই মাল খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অনুপমা ধাঁইধাঁই করে রিক্সায় চড়ে বসতেই মনে হয়েছিল চালে ভুল হয়ে গেছে তার। শালা রতাটা মাল ছাড়া কিস্যু বোঝে না। বলে দিল কিনা বৌ ফৌ ক্যানি ছাড়ো, মাল দিলে পার্টি হবে আর গুপেটা বান –

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই চমকে গেল অনিন্দ্য। বারান্দায় দরজা হাট্ করে খোলা। মালিক থাকে একতলায়। ছাপোষা মানুষ। কোনোরকম বাদ -বিবাদে নেই। ওর ফিরতে দেরি হয় দেখে সিঁড়ির দরজা খোলাই রাখে।

টিম্টিম্ করে চল্লিশ পাওয়ারের আলো জ্বলছে বারান্দায়। কেউ নেই। টেবিলেও কোনো খাবার - দাবার নেই। প্রথম ঘরটার দরজায় হাত দিতেই খুলে গেল দরজা। অনু নেই সেখানে। একগাদা পুরোনো ছেঁড়া বই, তানপুরা ওলোটপালোট হয়ে আছে। খাওয়া চায়ের কাপ তেমনই বসানো। দুটো পোড়া বিড়ি পড়ে আছে মাটিতে। ছাইগুলো দলামচড়া হয়ে ঘুরছে হাওয়ায়। একটা ভ্যাপসা গন্ধ। সন্ধ্যের পর কেউ জানলাও খোলেনি বোধহয়। এমনিতেই যা বৃষ্টি হচ্ছে।

পরের ঘরটাও অন্ধকার। অনিন্দ্য ঠাওর করে দেখল অনুপমা পড়ে আছে বিছানায়। উপুড় হয়ে। বোধহয় শাড়ীটাও ছাড়েনি। একেবারে এলোমেলো। মনেহয় সটান বাড়ী ফিরেই খিল দিয়েছে।

দু-তিনবার ডাক দিল অনিন্দ্য। -অনু, এই অনু। দরজা খোলো, ভুল হয়ে গেছে, প্লিজ।

কোনো সাড়াশব্দ এল না। তবে শরীরের নড়াচড়ায় মনে হল, অনু জেগেই আছে। আরও চার - পাঁচবার অনুরোধ উপরোধেও দখন দরজা খুলল না, তখন সনিন্দ্য হুমকি দিল– বেশ, আমি বেরিয়েই যাচ্ছি। যতবার বলছি, আমার ব্যাপারটা জানা ছিল না। ওরা এরকম করবে – তা নয় – ধ্যাত্।

নির্বিকারভাবে দরজা খুলে দিয়ে অনু আবার খাটের ওপর ধড়াস্ করে পড়লে। ফুলিয়ে উঠল আর একবার। বেশ জোরেই।

– ন্যাকামি কোরো না তো। যে মনে হচ্ছে ওনাকে সবাই মিলে –

অনু কানে আঙুল দিল।

–ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে যেতে হবে না ওখানে। গেলে কন্ট্রিবিউশনটা একটু কম হয়, এই ভেবে – তো তাকে তোমার কি হল? এ্যাই, এ্যাই শোনো, কি হল – আরেঃ, ধ্যাত –

– ঢঙ করো না তো। অনুপমা ঘাড় শক্ত করে বলল।

– আচ্ছা বাবা, তোমাকে না হয় আমিই – দেখি তোমার কন্ট্রিবিউশনটা, দেখি, দেখি –

বিছানায় কাঠ হয়ে পড়ে রইল অনুপমা। অনিন্দ্য ওকে চিৎ করে দিয়েছিল। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে, জোর করেই। আড়ষ্ট হয়ে কনুই দুটোকে বুকের ওপর আড়াআড়ি করে রাখল অনুপমা। পা দুটোকে জড়িয়ে রাখল ভাঁজে ভাঁজে।

অনিন্দ্য ঘন হয়ে এল। না কাটা খরখরে দাড়িটা দিয়ে অনুপমার গালটার ওপর ঘষতে চাইল। তার হতাশা, একাকীত্ব ব্যর্থতা, সবকিছুকেই উগরে দিতে চাইল একেবারে।

অনুপমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। কানের পাশ দিয়ে বালিশের ওপর পড়ছিল টপ্‌টপ্। কিছুতেই সে নিজেকে উন্মুক্ত করল না - শত অনুরোধেও। ঘৃণায় তার শে, হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। এমন মানুষরাও । পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়ায়, সে আগে বোঝেনি। এবং অনিন্দ্যও যে নির্লজ্জ কাপুরুষতায় সবকিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে এল, তাও যেন সে মানতে পারছিল না।

বহু চেষ্টা করে নিষ্ফল হয়ে অনিন্দ্য উঠে এল বিছানা থেকে। তার মথায় যে আগুন জ্বলছিল। দুম্ দুম্ করে সামনের ঘরে ফিরে এল সে। এখনই একটা কিছু হেস্তনেস্ত করবে।

আলো জ্বালতেই দেখল জেমস্ জয়েসের ইউলিসিসটা পড়ে আছে অবহেলায়। সেকেন্ড হ্যান্ড বই - কলেজস্ট্রীট থেকে অনুপমা কিনেছিল বিবাহবার্ষিকীতে একবার। প্রফেসর হীরেন পড়াতেন বি.এ.তে। তার তো আর পড়া হয়ে উঠল না।

প্রফেসর হীরেনের গলা যেন সে শুনতে পেল। .... "Lightly, the less to disturb, reverently, the bed of concepetion & of birth, of consummation of marriage & breach of marriage, of sleep & death"-

এ শয্যা তার তাদের সুখ-সান্নিধ্যের শয্যা, জন্মপূর্ববর্তী ও জন্মের - জীবন ও নিশ্চিন্ত ঘুম এবং নিশ্চিন্ত ঘুম ও মৃত্যুর।

বেরিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো অনিন্দ্য। .... "of sleep &death ... of sleep & of death...

মানুষ কি শুধুই মরে। প্রতিবার কি সে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবার জন্ম নেয় না! এক পুর্নজন্মের আবহ। পতনের পরেও যে জীবন, তারজন্য অপেক্ষা করে থাকে আরও কিছু। অথবা -

চকিতে তার মনে এল - of death & of resurrection

সে বুঝতে পারছিল না। মৃত্যুর এবং পুনর্জন্মের!

ভূতগ্রস্থের মতো ব্রাউন সুগারের প্যাকেটটা হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল অনিন্দ্য। গলাটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চোখ দুটোও। এখনই তাকে তলিয়ে যেতে হবে আরও একবার। নিঃশব্দ, দুর্নিবার এক পতন। অনুপমার বদলে তাকেই আলিঙ্গন করবে সে। তারপর মৃত্যুর নির্জনতা থেকে জন্ম নেবে আবার যীশুর মতো।

।। পাঁচ।।

টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে বলেছিল অনুপমা। শ্রাবণের শেষ বিকেল । অন্ধকার নেমে এসেছে একটু আগে থেকেই। বৃষ্টিটা হয়েই চলেছে। তার থামবার কোনো মাত্র লক্ষণ নেই। ঘরের ভেতরের ভ্যাপসা একটা গন্ধ ভেসে আসছে চাপ হয়ে। । ঠিক ওর মনের মতই। এদিক সেদিক ছড়িয়ে আছে বই - খাতা, পুরোনো কাপড় - গামছা। পোড়াবিড়ির টুকরোগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে উদ্দেশ্যহীন। রান্না করে হাঁড়ি ভর্তি ভাত পড়ে আছে বারান্দায়। ডাল - তরকারী সব। বোধহয়, পিঁপড়েরা সার দিয়েছে ওদিকে। দুটো কাক এই বৃষ্টিতেও ওড়াওড়ি করেছে আর তারস্বরে জানান দিয়ে চলেচে তাদের ভালোবাসার ইঙ্গিত।

ভালোবাসার কথা মনে হতেই তার অনিন্দ্যর কথা মনে পড়ল। এমন কিছু তো সে করেনি, যার জন্য অনিন্দ্য বাসায় ফিরে এল না। বরং গতরাতের ঘটনার জন্য তারই ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া উচিত ছিল। কিসব বিশ্রী বদসঙ্গে পড়ছে ও, আজকাল। লোকগুলোকে তো কোনোভাবেই টলারেট করা যায় না। রোজগার নেই তো ঠিক আছে, সে তো কোনো কিছুই দাবী করেনি। তুলসীরাও ওদের চেয়ে বালো আছে। তুলসীর বাবার মাত্র হাজার টাকা রোজগার। বাড়ীতে দুই মেয়ে সহ ছজন। তবু এত অনটনেও কোনো সমস্যা হয় নাতো ওদের। আধুনিকতা মানে এই নয়, কিছু পেতে গেলে, সর্বদ্ব দিতে হবে। তার একান্ত নিজস্ব সত্ত্বা, ভালোলাগা, মন্দলাগা। লোকদুটো যেন চোখ দিয়ে চাটছিল। মাল খাচ্ছিল বোধহয়। ওকে যেন মালের চাট ভাবছিল। ছিঃ ছিঃ। আর অনিন্দ্য ওদের রিড করতে পারলো না! খুব তো বলে, হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা। ও নাকি খুব লোক চেনে। ফুঃ লোক চেনে! ভাগ্যি রিক্সা নিয়ে সময় মতো বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। নাহলে কি যে হতো -

অনিন্দ্যও মাল খেয়েছিল বোধহয়। গতরাতে কেমন যেন ওকে অস্বাভাবিক লাগছিল। মাঝেমধ্যে ও যে খেয়ে আসে না তা নয়। কিন্তু টোর যে অন্যরকম গন্ধ। বাংলা না কি যেন বলে - মাকালী ব্র্যান্ড। অসভ্যতার জায়গা পায়নি। বিয়ে করেছে বলে সব কিনে নিয়েছে না কি! যখন তখন এসে বিরক্ত করবে। এবার স্ট্রেট বলে দেবে, সেরকম হলে নিজের রাস্তা খুঁজে নাও। যা চাইবে, যখন চাইবে সব পাবে। তার ভালো লাগেনি, সে রেসপন্ড করেনি, ব্যস্। যা খুশী করুক গে। মরে, মরুক। জীবনে সবাই মরবে একদিন না একদিন। ভালোবাসা, কিসের ভালোবাসা? শালা ভালোবাসার মাথায় ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার -

সে নিজেই চমকে উঠল। এমন কথা কখনও ভাবেনি। চিরদিন গুডি গুড়িয়া থাকতে চেয়েছে। কোনো নোংরা কথা, কুৎসিত চিন্তা সে মাথায় আনেনি। আজ এসব কি হচ্ছে ভালোবাসা চুলোয় যাক্। অনিন্দ্য এখন মানে মানে ফিরে আসুক। কি খেল, না খেল সারাটা দিন। সকাল থেকে কোনো কথাও বলেনি সে। অনিন্দ্যও তাই। দুজনে দুজনকে পাশ কাটিয়ে গেছে। যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখেছে। যদি অনিন্দ্য ফিরে না আসে একদমই। খুব থম্‌থমে মুখ নিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে সাতসকালে। অনুপমার ভয় ভয় করতে লাগল।

সত্যি যদি কিছু করে বসে অনিন্দ্য! তার মনে পড়ে গেল কলেজ লাইফের কথা। জেদ করে পড়া ছেড়ে দেবার কথা। গঙ্গার ঘাটে পড়ে থাকা কাদামাখা দেহ। শেষ করে দিতে চাওয়া তাকে ভালোবেসে। অথচ কোনোরকম দাবী না করেই। কি অদ্ভুত ভালো ছিল ও। এতটা ভালো, এতটা পাগল তার ভালোবাসায়! এর মর্যাদা সে দিতে চাইল না! হয়তো কিছু টাকা হঠাৎ পেয়ে যাবে ভেবে প্রমোটারদের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলছিল। এছাড়া তো তেমন কোনো অপরাধ করেনি সে। কোনো আর্থিক কেলেঙ্কারী বা কোনো নারীঘটিত বোঝা। হয়তো পথটা একটু ভুল হয়েছিল। এই একবিংশ শতাব্দীতে ওটা কিছুই নয়। আর তার আচরণে লোকে নির্ঘাত হাসবে। বলবে গানের শুদ্ধ স্বরের সাধনা করতে করতে তোর মাথাটা একদম গেছে। এ্যাতো সেন্টিমেন্টাল হলে চলে! আরে বাবা, যখন মেয়ে হয়েই জন্মেছ, আর দেশটা যখন ভারতবর্ষ তখন তোমার স্বাধীনতা - স্বাধীনতা সব ফালতু কথা। সে তুমিই হও আর তুলসীই, সব এক -

তুলসীটাকে বেশ দেখতে তাই না। লোকে বলে, একটু ছেলেটে গোছের কিন্তু একটা ঋজু ভাব আছে ওর মধ্যে। বিভিন্ন জজায়গায় অনাবশ্যক মাংস লেগে থলথলে মার্কা হয়ে যায় মেয়েরা। বিশেষতঃ এইসব মফঃস্বলে যেখানে জিম ফিম সেরকম নেই মেয়েদের জন্য। একটা সুঠাম লম্বা চেহারায় মেয়েলী মেয়েলী না লাগলেও সজীব গাছের মতো ওর যৌবন। অনুপমা দেখেছে দুপুরে যখন ঠাকুরঘর এসেছিল তুলসী। সে কি একবারও ভাবেনি কত আকর্ষণীয় তুলসীর কোমার ছাপানো চুল, তার অত্যন্ত সরু কোমর অথবা ক্ষুদ্র কিন্তু ক্ষিপ্র বুক। ভিজে কাপড়ে দেহের অভ্যন্তর যতই ফুটেছে, ততই সে ভালোবাসতে চেয়েছে নিজেকে। আয়নার সামনেও একা একা দাঁড়ানোর সাহস হয়নি তার কোনোদিন। তাই যখন চোখের সামনে তুলসীকে দেখল তখন যেন তার ভেতরের সবকিছু একবার প্রবল বিদ্রোহ নড়াচড়া করে উঠল। ভেঙে দিতে চাইল। নিজেকে উপেক্ষা করে থাকার, আত্মমগ্ন হয়ে চিরকাল প্যাসিভ হয়ে থাকার চেষ্টা। বারবার বালোবাসাগুলো সম্পূর্ণরূপ না দিয়ে এক অন্যরকম ভাবনায় ডুকে থাকা। শুধুমাত্র গতরাত বলেই নয়, যে প্রবল আকাঙ্খায় সে অনিন্দ্যকে বিয়ে করেছিল, এক আত্মহত্যাকমী মানুষের তাৎক্ষণিকতা ও হঠকারিতায়, তাকে পূর্ণ রূপ সে দিতে পারেনি। চরম ভালোবাসার ক্ষণেও সে ভেবেছে কেমন ভাবে সব স্বরগুলোকে আরও আয়ত্ত করবে যাতে তিনটে অক্টেভই তার অনায়াস বিচরণের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে। আর আজকে যখন ভয় করছে তার, এক প্রবল ভয়, অনিন্দ্য একেবারে না ফিরে আসার ভয়, তখনও সে ভাবছে অনিন্দ্য ফিরে এলে সে নিরাপদ আশ্রয়টু অন্ততঃ পেয়ে যাবে। এছাড়া আর কিছু নয়। শুধুমাত্র তাকে ভালোবেসেই যে ভালো থাকা যায় একদম বিশুদ্ধভাবেই, অন্যকোনো নিয়ন্ত্রণ অথবা উদ্দেশ্য ছাড়াই - সেটা ভাবতে পারছে না কেন! তাহলে এই ভালোবাসা কি উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক্, অন্য কোনো এক আপোরিত অভীপ্সায় তার দিক্ পরিবর্তন করেছে? এতোদিন এই ক্ষরণ সে বুঝতে পারেনি কেন? অথবা, এই বিপথগামীতাকে সে প্রশ্রয় দিয়েছে একদম সচেতনভাবে যখন অনিন্দ্যর মূল্যবান তার কাছে একটু একটু করে নেমেছে। অথবা এই বিপথগামীতাকে সে প্রশ্রয় দিয়েছে একদম সচেতনভাবেই যখন অনিন্দ্যর মূল্যমান তার কাছে একটু একটু করে নেমেছে। এই অধোগমন, এক দুর্বিনীত অবক্ষয় পোষণ করেও সে ভদ্র, মার্জিত জীবন - যাপনের এক সাবলীল প্রকাশে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে নিজেকে, দিন। এর চেয়ে প্লেন বেলেল্লাপনা করাই তো ভালো ছিল। অথবা অনিন্দ্যর কাছে এক অকপট স্বীকারোক্তি যে তার মূল্য কমেছে। তার ফল যাই হোক্ না কেন।

হঠাৎ করে কলিংবেলটা বেজে উঠল। অনুপমা অন্যমনস্কভাবে বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিয়েই চমকে উঠল। অনুজ শর্মা। অনিন্দ্যর সবচেয়ে কমবয়সী বস্।

।। ছয়।।

এক অদ্ভুত সময়ে অনুজ শর্মার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল। অনিন্দ্য তাকে নিয়ে গিয়েছিল বিড়লা সভাঘরে - অফিস ফাংশনে। এ্যাড কোম্পানীর চাকরী নিয়ে তার আর কোথাও যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না, একমাত্র অফিসের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আসা ছাড়া। বিভিন্ন মানুষ জনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। হৈ-হুল্লোড়। এরা অবিশ্যি প্রতি বছরই কোনো না কোনো নামী শিল্পীকে আমন্ত্রণ করে থাকেন। কিশোরী আমনকর, শোভা মুদ্গল। অথবা শিবকুমার শর্মা, হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া। সুর ও স্বরের সাধনায় এক - একজন উত্তুঙ্গ হিমালয়ের মত হয়ে ওঠেন, প্রদর্শন করে যান তাঁদের গরিমা, আর্তি ও বিনম্রতা। সুন্দরের কাছে সে প্রণাম থেকে যায় এক চিরন্তন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে, চাঁদের বুকে মানুষের প্রথম পদক্ষেপের মত। একক ও অনন্য।

সেদিন দুপুরের আয়োজন ছিল বিশাল।, তাজ বেঙ্গল থেকে অর্ডার দিয়ে লাঞ্চ আনা হয়েছিল। এম. ডি. উড়ে এসেছিলেন মুম্বাই থেকে। অনুষ্ঠান সম্প্রচারের দায়িত্ব ছিল সন্তোষ বাজপেয়ীর হাতে। কোম্পানীর চিফ্ প্রোডাকশন ম্যানেজার - যিনি একজন ফ্যাশন ডিজাইনারও বটে। ভদ্রলোকের মধ্যে রুচিবোধ ও শিল্পীসত্তা দুটিই প্রবল।

লাঞ্চ পর্বে এম. ডি. এসে পৌঁছতে পারেননি। ফলে একটা হাই-টির আয়োজন করতে হল। লাঞ্চ খেয়েই কেমন অস্বস্তি লাগছিল। তব্যু হাই - টিতে যোগদান করতেই হল সকলের অনুরোধে।

প্রোগ্রাম চলার মাঝপথেই শুরু হল বমি। মাথার যন্ত্রণা। চোখ দুটো যেন ছিঁড়ে আসতে চাইছিল। ভালো লাগছিল না কিছু।

অনিন্দ্য ছিল এদিক সেদিক। আমন্ত্রিত অতিথিদের দেখাশোনা করা। আপ্যায়ণ ঠিক না হলে মুশকিল। বিশেষতঃ বড় কাস্টমার এবং এক্সিকিউটিদের মেজাজ - মর্জি এক - একরকম। সব পর্ব শেষ করে যখন সে ছাড়া পেল তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে। ঘড়ির কাঁটা বারো ছুই ছুঁই।

অনুপমা গ্রীণরুমের পাশের একটা রেস্টরুমে বসে হাঁফাচ্ছিল। পেট ব্যাথা করছে। গা গোলানি ভাবটা কাটেনি তখনও। মাথাটা ভার হয়ে আছে। মনে হয় উঠতে গেলেই পড়ে যাবে।

অতরাতে কিভাবে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে অনিন্দ্য বুঝতে পারছিল না। পাওয়া গেলেও উত্তর শহরতলির এক প্রত্যন্ত প্রান্তে যেতে রাজী হবে না একদমই। এদিকে কলকাতায় তাদের চেনাজানা এমন কোনো আত্মীয় স্বজন অথবা বন্ধুবান্ধব নেই যার কাছে গিয়ে ওঠা যায়। অনুপমা আগে কোনোদিন এরকম অসুস্থ হয়ে পড়েনি - তাই কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করেনি।

গাড়ী নিয়ে বেরুতে গিয়ে অনুজ দেখল অনিন্দ্য দাঁড়িয়ে আছে হতাশ ভঙ্গীতে আর অনুপমা কোনোরকমে কুঁকড়ে বসে আছে পোর্টিকোর লম্বা সিঁড়িতে। হঠাৎ করে হাওয়া উঠেছে একটা, আর সে ডাক দিয়ে এনেছে টিপটিপ বৃষ্টি। আকাশকে মাঝে মাঝে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ।

অনুজ ঘটনাটা জানত না। কিন্তু হঠাৎ কিছু একটা হয়েছে সন্দেহ হওয়ায় দাঁড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল - মসীবত মে ফাঁস গয়া ক্যায়া, ইয়ার?

- মিসেস কা তবিয়ত ঠিক নহি। এক ট্যাক্সি বুলানা পড়েগা।

- আরে ইয়ার, ছোড় দেতা হ্যায় তুমকো। কাঁহা জায়েঙ্গে? হাওড়া?

অনুপমাকে কোনোরকমে ধরে ধরে নিয়ে এল অনিন্দ্য। আর তার অসুস্থতায় গুরুত্বটা বুঝতে পারল অনুজ।

সেইরাতটার কথা এখনও ভুলতে পারেনা অনুপমা। এক কৃতজ্ঞতায়, সযত্নে সে মনে রেখেছে অনুজের আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও উদ্বেগ।

কথায় কথায় অনুজ জেনে নিল তাদের বসবাসের ঠিকানা। কাছে শহরতলী হলেও সে বুঝে নিল এতরাতে সেখানে যাওয়া উচিত হবে না। তাছাড়া অনিন্দ্যর মিসেসকেও একাবার ডাক্তার দেখানো দরকার। তার ফ্ল্যাটের পাশেই ডাক্তার বৈদ্য। এক্স সার্ভিসম্যান। তবে চিকিৎসাটা তিনি খুব ভালোই করেন। এবং সবচেয়ে বড় সুবিধে হল এই যে, ওনার সময়ের ব্যাপারে কোনো কিন্তু নেই।

অনুজের অফিস লীজড্ ফ্ল্যাট। একটা লিভিং রুম - সিঙ্গল বেড। বেডরুমটা প্রশস্ত। ডাবল বেড সহ এ্যাটাচড্ বাথ।

বেডরুমটা তাদের জন্য ছেড়ে দিয়ে অনুজ চলে এসেছিল লিভিং রুমে। একটা রাতের জন্য কিছুই সমস্যা নয়, সে বলেছিল। এও জানিয়েছিল বাথরুমটা দরকার হতে পারে ভাবীজির। তারজন্যে অনিন্দ্যর বসের হয়রানি মনে করে অনুপমা লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিল। আর সেই রাতে বাইরের বৃষ্টি আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল। এক সাপিনীর মত্ততায় খেলা করে যাচ্ছিল বিদ্যুৎ। সারারাত এই খেলা চলল। আর অন্ধকারে হঠাৎ করে জ্বলে ওঠা প্রাকৃতিক শিখার মাঝে সে দেখেছিল অনুজকে। তার দীর্ঘ দেহ, গভীর চোখ, অত্যন্ত পরিশীলিত ব্যবহার এবং ঈর্ষনীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। সহকর্মীর জন্য একটু বা ভাবনা, যা তার চরিত্রের অন্যান্য গুণগুলির মতোই আলো ঝলমল।

সে পড়ে থাকল বিছানায়। অনিন্দ্যর গায়ের খুব কাছাকাছি নৈকট্যে। তার ভালোবাসার তাপ ও উদ্বেগের আবেগে জড়ানো আবেশ ছুঁয়ে যাচ্ছিল প্রতি নিয়তই। তবু সে ভাবতে লাগল অনুজের কথা। তার সম্পূর্ণটাকে সে দুহাতের মধ্যে ধরতে চাইল, জোর করে নামিয়ে আনতে চাইল তার মুখ, একগাদা কোঁকড়ানেত্রা চুল, ঝলমল হাসি। এক রাগের সাধনার মতো সে সেধে চলল, অনুজ, অনুজ। অনিন্দ্য কিছুই টের পেল না। প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে এক অন্যতর সঙ্কট নিয়ে সে থেকে গেল সারারাত।

পরদিন ভোর ভোর তারা বেরিয়ে আসতে চাইছিল। বরিবার, কোনো তাড়া ছিল না তবুও। একদিন গভীর সঙ্কোচ থেকে পরিত্রাণের জন্য এছাড়া কোনো পথ ছিল না।

অনুজ ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাবার জন্য অনুরোধ জানাল। অনিন্দ্যর যে একটু ইচ্ছে ছিল না তা নয়, কিন্তু অনুপমার জেদাজেদি মুখ্য হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত দু গ্লাস ফ্রুট জুস খেয়ে তারা বেরিয়ে এসেছিল। বাইরে এসে বিদায় জানিয়েছিল অনুজ। তার পরণে তখনও রাতের পোশাক, চুলও এলোমেলো, গভীর ঘুমের ছায়া মাখা দু'চোখ। তবুও কি জানি এক দেবতার মতই চির সতেজ। তাঁদের যে কোনো প্রসাধনের প্রয়োজন হয় না!

সে অনুজ আজকে এসেছে। কোনো খবর না দিয়েই। খবর দিলেই বা অনুপমা কি করতে পারত।

এর আগে দু'একবার যে ফোনে কথা হয়নি তা নয়। বিশেষতঃ যে দিন গুলোতে অনিন্দ্য বাড়ী আসতে পারবে না অথবা দেরী করে আসবে সেদিনগুলোতে। সংবাদসূচক সে ফোন কলগুলো নিছক খবরই বহন করেনি, আরও অনেক কিছুর মোড়কে সজ্জিত হয়ে গেছে। তার অজান্তেই একেকটি রাগের দেহ থেকে কসে গেছে শব্দ স্বর। হঠাৎ করে ঢুকে পড়েছে অন্য কেউ। জন্ম নিয়েছে একেকটি ঠুংরি। যার মর্যাদা সহকারীর হলেও অনেক মোহমুগ্ধতায় তার বিচরণ। অন্যতর এক বিলাসে, ভালোবাসায়।

হঠাৎ করে ঢুকে পড়ার জন্য অনুজ মাফ চাইল। এক নিঃশ্বাসে বলে গেল অনেক কিছু। জানতে চাইল অনিন্দ্য কোথায়? তাকে সে হেল্প করতে পারে কিনা?

- আপনারাই তো ওর চাকরীটা খেয়েছেন।

- সরি ম্যাডাম। আই ওয়াজ আউট অফ স্টেশন।

- কিন্তু আপনিতো জানতেন।

- না, এক্সিকিউটিভ কমিটি ডিসিশনটা নিয়েছিল। পরে বোর্ড মিটিংয়ে ব্যাপারটা জানতে পারি এবং এটা যে অন্যায় হয়েছে তাও প্রোটেস্ট করি।

- কিন্তু হল কি তাতে?

- না, ওর অনেক অপোজিশন ছিল। তবে আই মাস্ট ডু সামথিং ফর অনিন্দ্য।

- কি করবেন?

- একটা দুটো ইনফরমেশন দিতে পারি। ও গিয়ে কন্ট্যাক্ট করতে পারে।

- ওঃ। এই পর্যন্ত। ও প্রমোটারি করবে।

অনুপমা মুখ ঘুরিয়ে জানালার ধারের চেয়ারটায় বসে রইল গোঁজ হয়ে

অনুজ উঠে এল। সে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। জানলা এবং অনুপমার সংক্ষিপ্ত ফাঁকটুকুতে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল – ফাইন্যান্স?

- কিছু নেই। জানিনা ও কি করবে। এই নিয়ে আমার সঙ্গে তুমুল অশান্তি হয়েছে কাল রাতে। ইনফ্যাক্ট, হি কান্ট সারভাইভ। এভাবে বেঁচে থাকা যায় না।

- হোয়াট হ্যাপেনড? উদ্বিগ্ন শোনাল অনুজের গলা।

- আই কুড নট রীড হিম। অনুপমা নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ভেঙে পড়ল একেবারে।

অনুজ এসবের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। প্রথমটার সে একটু পিছু হটে গেল। তারপরেই এক গভীর মমত্ববোধে, পরম যত্নে এগিয়ে এল। হাত রাখল অনুপমার পিঠে। - আই প্রমিস, ডোন্ট ওরি।

অনুপমা কিছু বলতে পারল না। চোখ মুছে নীচু হয়ে রইল।

অনুজ বলল, - ম্যাডাম, স্মাইল প্লিজ। অব বোলা না ম্যায়নে। হাঁসিয়ে না!

এর আগেও কতবার এই একই কথা অনুজ বলেছে ফোনে। স্মাইল প্লিজ। 'আপনার হাসি আমাকে ভালো লাগে'। অনুপমা হেসেছে। ফোনে। শব্দ করেই। অনুজ আবারও বলেছে 'ঔর একবার ফির'। - তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। বলেছে অনুপমা। অথবা বলেছে না, হাসবো না একবার। এবং যথারীতি ফোর ছেড়ে সময় হেঁসে ফেলেছে।

আজও তাই ঘটল। চোখ নীচু করেই সে হাসল। মাটির দিকে চেয়ে তার কান্না - হাসি ধরা পড়ে গেল অনুজের কাছে। সে আরও একবার নীচু হল। হাত বুলিয়ে দিয়ে অনুপমার চুলে।

সঙ্কট মুহূর্তে এমনই ঘটে যায়। এমনই এক সংঘটন, বিপ্লব, বিপর্যয় অথবা বিদ্রোহ। এক অদ্ভুত অনির্দিষ্ট উৎকণ্ঠা। প্রবল আঘাতে সে ছিটকে বেরিয়ে আগে। চুরমার করে দেয় সবকিছু।

অনুপমা কিছু বুঝতে পারছিল না। অনুজের গরম নিঃশ্বাস এসে পড়ছিল তারর পিঠের ওপর। অনুজ যতদিন দেবতা হয়ে থেকেছে ততদিন শুধুমাত্র শ্রদ্ধা নিয়েই সে অপেক্ষা করেছে তার জন্য। কিন্তু যখনই সে একজন মানুষ হয়ে উঠল, তখনই হাসি - কান্না - দুঃখ-সুখ-অভিমান-অনুরাগ-প্রেম-ভালোবাসা সবকিছুতে ভরভরন্ত হয়ে ওঠে এক প্রবল জীবন তাকে ধাক্কা দিয়ে গেল। হঠাৎ করেই আবিষ্কার করল সে জড়িয়ে গেছে প্রবলভাবেই। ছাড়ানোর চেষ্টা করলেও কোনোভাবেই সে বাধার প্রাচীর খাড়া করতে পারল না। অনুজের নৈকট্য এক অপরিসীম গহনের দিকে তাকে টানছিল। সেই আকর্ষণ নিছক কোনো দেহবিলাসের মোড়কে মোড়া ছিল কিনা, তারও কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই। এক অদ্ভুত মাদকাসক্ত বিপন্নতা তার চেতনায় ঝিম ধরানো এক অনুভূতি এনে দিয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল এটা পাপ, গর্হিত, সামাজিক নিয়ম নীতি বিরুদ্ধ। তবু এই ক্রমপতনের অনিবার্যতায় সে ডুবতে লাগল এক অবিশ্বাস্য ভারশূণ্যতায়। যেভাবে গাছের পাতারা ঝরে পড়ে - তাদের মৃত্যু আগে হয়ে গেছে কিনা সে প্রশ্নর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকেই।

একটি ঠুংরীর আবেশ তার মনে আসছিল শুধু।

থির না মানে মন হামারা
সজন বিনা রে।
উদাস রহে সাঁঝ সবেরা
মুস্কিল জিনা রে।।
আঁসু বহাতা দোউ নয়ন
হিয়া মেঁ উঠত ধড়কন
কোঙ্গ সখী জা পিয়া কো মোরা
অব লা দেনা রে।।

হৃদয়ে এক রক্তবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল তার। ঝম্‌ঝম্, ঝম্‌ঝম্, প্রবল বেগে ভালোবাসাবাসি করা দুটো কাক তখনও ওড়াউড়ি করছিল।

।। সাত।।

বৃষ্টিমাতন সন্ধ্যায়, বাসে করে এসে হঠাৎ করে ময়দানে নেমে হাঁটতে থাকে অনিন্দ্য। চারিদিক শুনশান। এখানে বৃষ্টির ফোঁটারা পড়ে যায় কোন শব্দ না করেই। মানুষের অনেক কিছু বেদনার মতোই। দৃশ্যমানতা আছে কিছুটা কখনও - সখনও - কিন্তু কোন পরিধি নেই। ক্ষরণ হবার পর যেমন জানা যায় বেদনা। অথবা কোন ঘটনার উত্তরাধিকার হিসাবে কোনোকিছু ভালোলাগা বা মন্দলাগা।

এই নিঃশব্দ ক্ষরণ কি মৃত্যু? অথবা তা জন্ম দিয়ে যায় জীবনের! বৃষ্টির ফোঁটারা একটি একটি ফুলের মতো ঝরে যাচ্ছে, যাচ্ছেই, আর তারা আশ্রয় নিচ্ছে গাছের তলায়। ঘাসেরা শকড় দিয়ে শুষে নিচ্ছে সেই জল। মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে কোনো অভীপ্সায়। দলিত মথিত হয়ে যেতে যেতেও বাঁচার জন্যেই।

মানুষ কিভাবে জীবনকে বরণ করে নেবে তা নির্ভর করে ব্যক্তিসত্ত্বার ওপর। এ যেন এক খাড়াই পথ বেয়ে নিরন্তর চলা - একদিকে উত্তুঙ্গ গিরিশিখর, অন্যদিকে অতলস্পর্শী গিরিখাত। 'অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনদর্শনের ওপর নির্ভর করে কোনো ঘটনার অভিঘাতে তার আরাধ্য হয়ে জীবন না মৃত্যু' - উত্তমা বলেছিলেন। 'কোন একজন ভাবতে পারে বিপরীত। ভাবতে পারে এ দুঃখ সহনীয় নয়। প্রাণ গড়িয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। এবং তারা মৃত্যুর আরাধনা করে।'

কেমন করে যে উত্তমার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল তা অনিন্দ্য জানে না। কেমন একটা ঘোর লেগে গিয়েছিল তার। প্রতিষ্ঠিত জীবনে হঠাৎ করে নেমে আসা অনিশ্চয়তা তাকে ব্যাকুল করেছিল। এতটা বিপর্যস্ত সে কখনও বোধ করেনি। এমনকি অনুপমাকে মনে মনে ভালোবেসে তার জন্য প্রাণ দিতে গিয়েও। সে বারবার রবিবাসরীয়-র গল্পটা পড়েছিল। নন্দর চায়ের দোকানের পুরোনো কাগজটা চেয়ে নিয়ে এসেছিল কিছুটা পথ গিয়েই। তার মনে এক প্রবল বিশ্বাস জেগেছিল ফুল বাগানের মালীর উপড়ে ফেলা গাছটার মতো তাকে কেউ কুড়িয়ে মেবে। এ পৃথিবীতে উষ্ণ স্পর্শের অভাব নেই।

অনুপমা তাকে স্থান দিল না। তার অনু তাকে বুঝল না। এটুকু বুঝল না, সত্যি অনিন্দ্য তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চায়নি। তবে অনিন্দ্য প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারেনি - যখন অনু ভেবেছে তাকে হেনস্থা করা হচ্ছে। আসলে দীর্ঘদিন থেকেই হেরে গেছে অনিন্দ্য। না পড়াশুনায়, না চাকরীতে - কোথাও সে সিরিয়াস হতে পারেনি। চাকরী চলে যাওয়ার সময়ও সে হাতে পায়ে ধরে চাকরী বজায় রাখার অভ্যাস রপ্ত করতে শেখেনি। সর্ববিচারে একজন ডাহা ফেল করা মানুষ।

তবু কেন জানেনা Death and resurrection কথাগুলো সে পিঠোপিঠি, পাশাপাশি ভাবে। আর তখনই সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়। ছাই হয়ে যাওয়া স্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখী হয়ে উড়ে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্খায় স্বপ্ন দেখে। জীবন জিজ্ঞাসার তাগিদে সে উত্তমার কাছে তার লেখা গল্পটাই উগরে দেয়। তারপর বলে ফেলে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনটাইতো এরকম। বড় হতে চাই প্রবল আকাঙ্খায়, ভালোবাসায়। কেউ যদি ফেলে দেয়, অন্য কেউ কি কুড়িয়ে নেবেই সবসময়? প্রতিদিনের তীব্র অভিঘাতে, যন্ত্রণায় কোনো উত্তর খুঁজে পাই না। সংশয়ে ক্লান্ত হয়ে যাই মনে হয় প্রত্যাখানই আছে একমাত্র স্থির হয়ে।

উত্তম শান্তভাবে হাসেন। বলেন, দেখুন গল্পটাতে আরও একটা দৃশ্যকল্প আছে। পূবের তারাটি পশ্চিমের তারার কাছ যেতে চায়। তার সেই সাধ পূর্ণ হবে কি না কেউ জানেনা। তারা চলমান। মানুষের মতোই। গাছটি কিন্তু একমাত্র কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষায় থাকে। ''জীবনকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করে দেবে কিনা সে সিদ্ধান্ত তো জীবনের। এইখানেই তার খবরদারি - বেঁচে থাকা বা না বাঁচার।''

দু-চারটে বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে অনেক দূরে। অনিন্দ্য যেন দেখতে পায় ওপাশটায়, যেখানে ঝুপড়ি শুরু হয়েছে। এ মাতনে তাদের সায় নেই। গা উদোম। ঝুপড়িতে ঢোকার জো নেই। সবকিছু ভাসিয়ে দিয়েছে। উষ্ণ আশ্রয় নেই ভেতরে। খোলা আকাশের নীচে একদম উদোম, অসহায়। সে যেন শুনতে পায়, তারা বলছে এ বাগান থেকে উপড়ে দিয়েছে আমাদের কোনো কৌলিন্য নেই। নেই কোনো পরিচয়। কেউ কি নেবে গো আমাদের? ডাক দেবে অন্য কোথাও যাবার জন্য? আমরাও তো বাঁচতে চাই।

আকাশ আবার কালো হয়ে আসে। ভীষণ নিকষ অন্ধকার। পুবের বা পশ্চিমের কোনো তারাকেই দেখা যায় না। সবকিছু একাকার।

অনিন্দ্য ভাবে লঞ্চে ভিক্ষে করে যাওয়া খোঁড়া ছেলেটার কথা কোনো কথা বলে না, কালো, দাঁত বার করা। তবু কি মায়াময় মুখ। শুধু ও হাত পেতে যায়। কোনো লড়াই করে না কোনোদিন।

সে ভাবে প্রতিদিন ছেলেটিকে এক টাকা দেবে। মাসে তিরিশ। এমন কিছু নয়।

হঠাৎ করে অনুপমার কথা মনে পড়ে। তার মুখ, চোখ, কপাল, কপালের লাল টিপ, সবকিছু। সেটা পশ্চিমের না পূবের তারা সে বুঝতে পারে না। উত্তমার কপালের টিপ এবার জ্বলজ্বল করে ওঠে। দুটি তারার মিলন দেখতে সে আগ্রহী হয়। প্রবলভাবেই।

* * *

হাসপাতালে মাথা নীচু করে বসেছিল অনিন্দ্য। অনুপমা শুয়ে আছে বেডে। কাচের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় এখনও লাগানো আছে অক্সিজেনের নল। ডাক্তার বারণ করে গেছে ওকে বিরক্ত করতে।

বৃষ্টিতে এদিক - সেদিক ঘুরতে ঘুরতে সেদিন দেরী করেই ফিরেছিল অনিন্দ্য। যথারীতি দেখেছিল দরজাটা খোলা। আশঙ্কা ছিল আজও একচোট হবে অনুপমার সঙ্গে। তবুও সে অনুপমাকে ভালোবাসতে চাইছিল। মিটিয়ে নিতে চাইছিল সবকিছু। তার ক্ষোভ, দুঃখ, যন্ত্রণা।

উত্তমা তাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করেছিল কি না বোধগম্য হয়নি তার। একজন বিদূষী সম্ভ্রান্ত নারীর মতন লেগেছিল তাকে। যাকে দেখেই শ্রদ্ধা আপনা আপনি এসে যায়। আসলে মেয়েদের সামাজিক অবস্থানটা কোনো সাধারণ আটপৌরে জীবন - যাপনের মধ্যে আলাদাভাবে উপলব্ধি করতে শেখেনি পুরুষ সমাজ। তারজন্য নিয়মিত প্রয়োজন হয়েছে উপযুক্ত স্থান ও কাল। গুরুত্ব বোঝানোর উপযোগী।

বারান্দা পেরিয়ে তাদের শোবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে অনিন্দ্য। আর তখনই দেখেছিল অনুপমা পড়ে আছে চিৎ হয়ে। একটা হাত চৌকাঠের ওপর। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে। একটু দূরে পড়ে আছে কীটনাশকের কৌটো।

কিছু বোঝার আগেই চীৎকার করে উঠেছিল অনিন্দ্য। প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বশবর্তী হয়েই। একতলা থেকে উঠে এসেছিলেন বাড়ীর মালিক - পাশের বাড়ীর থেকে তুলসীরাও। তাড়াতাড়ি এ্যাম্বুলেন্স ডেকে অনুপমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অনুপমা, শান্ত মিষ্টি স্বভাবের একটা মেয়ে - যে এমন একটা কান্ড করে বসবে, ভাবতে পারেনি কেউ। অনিন্দ্য বুঝতে পারছিল না সামান্য ঘটনা থেকে কিভাবে অনুপমা এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল!

প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার পরের সবকিছু একটু থিতু হতেই তুলসীর মা তাকে ডেকেছিল। দাদাবাবু একটা কথা শুনবে। আজ তোমাদের বাড়ীতে একজন এসেছিল। লম্বামতন, সাহেব - সাহেব চেহারা। কোট পরা। ছাই - ছাই রঙের বড়ো মটোর গাড়িতে এসেছিল।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অনিন্দ্য।

- বৌদিমনি এমনিতে খুবই ভালো। তবে কিনা বাড়ীতে নিজের মানুষ নেই, অমন একটা হোম্‌দা মুখো লোকের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা - অবিশ্যি জানিনা বাপু, তার দাদা টাদা এয়েছিলো কিনা! কোনোদিন আসেনিতো কেউ এর আগে।

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে দুমদুম করে চলে গেল তুলসীর মা। অনেক কিছু ইঙ্গিত করেই।

অনিন্দ্য হতভম্ব হয়ে বসে রইল। -অনুজ! মোবাইলে ধরতে গিয়েও তাকে ধরল না অনিন্দ্য। অনুজের তার বাড়ী আসা, অনুর বিষ খাওয়া - কোনো পারস্পরিক সম্বন্ধ কি আছে এর মধ্যে। কোনো কিছু বিপদ সংকেত? আর তার অনু, তার ভালোবাসার অনু - যে অনুপমা গতরাতে তাকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি, সে কিনা...

হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা ভালোবাসা কোন্ পরিস্থিতিতে এমন বক্রগতি পেয়ে গেল তা বুঝে উঠতে পারল না। হয়তো কখনো সে বুঝতে চায়নি অনুপমা তারজন্য অপেক্ষা করেছে আর সে সময়ে সে অ্যাড কোম্পানীর ব্যস্ত সিডিউল নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। এমনকি অনুপমার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তেও তার মনে এসেছে পমি, বনি, বা রিনিদের চুল, মুখ, নখ অথবা ঈর্ষণীয় গোড়ালির ছলাকলা। পুতুল কিনে তাকে সাজিয়ে রেখে সে ভুলেই গেছে কবে সে পুতুল বিবর্ণ হয়ে গেছে। অপেক্ষা না করে অগত্যা অনুপমা তার পথ চলা শুরু করে পূর্বের তারাটির মত। এবং এভাবেই সে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছে এক বিপন্নতায়। এক হঠকারিতায় সে কি অন্যকিছু ভেবেছে?

অনিন্দ্য ভাবতে লাগল। মানুষ জীবনে বিপ্রতীপ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে তখনই যখন সে দেখে তার প্রার্থিত সামান্য সাধটুকুও পূরণ হতে পারে না। এ সেই চাহিদা নয়, অনায়াসে যাকে চেয়ে নেওয়া যায়। অথবা বিদ্রোহ করা যায় তার জন্য। এ মনোবাসনা কেবল হৃদয় নিভৃতে লালন করা যায় ছোট্ট কুঁড়িটির মত। ধীরে ধীরে সেই কুঁড়িটির মৃত্যু ঘটতে থাকে। জীবনের যে উদ্দেশ্য, জীবনকে ভালোবাসার যে তীব্র বাসনা, তা মনোবেদনা হয়ে রয়ে যায় বাকী জীবন।

অনুপমা দরবারী কানাড়া গাইতে ভারী ভালোবাসতো। একদিন বলেছিল - এই রাগটা কিসের ওপর ভিত্তি করে জানো? এক হস্তিনীর পাগলের মতো হস্তীকে খুঁজে পাওয়ার বাসনা। অন্ততঃপক্ষে আমার। তবে তাকে খুঁজে পাওয়ার পাগলামিতে হস্তিনীটি যদি জীবন বিসর্জন দেয় তাও আশ্চর্যের নয়। হয়তো এটা ভালোবাসারও অন্য এক দিক, যা দহনেই শান্তি পায়।'' - অনুপমা বলেছিল।

অনুপমা কি নিজেকেও কোনোদিন ভালোবেসেছিল? একটি নারী জীবনের তীব্র আস্বাদের সম্ভাব্য সুখে লালিত হতে! এক নারী হয়ে ওঠার চিন্তা কি তাকে বিধ্বস্ত করে গিয়েছিল! চিরকালীন এক শরীর ভাবনা, যা থেকে সে মুক্তি পায়নি একদম। সে কি 'ইউলিসিস'-এর মলির মতো কোনোনি ভেবেছিল-

''...still of course a woman wants to be embraced twenty times a day almost to make her look young no matter by who so long as to be in love or loved by somebody if the fellow you want isn't there sometimes by the Lord god I was thinking would I go around by the quay there some dark evening where nobody'd know me & Pick up a sailor off the sea that'd be not on for it & not care a pin whose I was only o do it off up in a gate somewhere...'' তারপর সে ভাবে এও এক পাপ। এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে মুখে তুলে নেয় বিষ।

অনুপমার জন্য তার চোখে জল এল। একটি শাল চারাকে বেয়ে উঠেতে চেয়েছিল কোনো লতানো গাছ। তাকে জড়িয়ে ধরে, প্রতিটি আকর্ষি তারই প্রশ্রয়ে ও বিশ্বস্ততায়

সমর্পণ করে। সে কি কুড়িয়ে নেবে না যা ভ্রষ্ট হয়ে গেছে! পৃথিবীতে তো উষ্ণ স্পর্শের অভাব নেই!

অনুপমার দেহটা নড়ে উঠল একবার। খুব ধীরে। যেন প্রাণের সাড়া জাগাতে শুরু করেছে একটু একটু করে।

দূর থেকে গভীর অনুভূতির এক রবীন্দ্রসঙ্গীত ভেসে আসছিল। ‘‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে’’। উদ্বায়ী সে সুর ভেসে যাচ্ছিল অনন্তলোকে।

‘‘এ জীবন পূণ্য করো দহন দানে’’ -

সে আবার ভাবল, ‘‘Resurrection’’ - আমাকে দহন দাও প্রভু। অনিন্দ্যর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল।

হঠাৎ-ই পুবের তারাটি পশ্চিমের তারায় মিশে গিয়ে বড় বেশী জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল।